প্রশিক্ষিত জনসংখ্যা আমাদের সম্পদ

সেলিনা আক্তার

জনসংখ্যা- যা সারা বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি মৌলিক উপাদান। এই ধারণাটি কখনো একটি রাষ্ট্রের সম্পদ আবার কখনো একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের অন্তরায়, যদি না এই জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা না যায়। তবে জনসংখ্যা কেবল সমস্যা নয়, বরং একটি রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর। এই ধারণাটিকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর ১১ জুলাই তারিখে পালিত হয় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস জনসংখ্যা দিবস, যার লক্ষ্য বিশ্ব জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের ওপরে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। ১৯৯০ সালের ১১ জুলাই প্রথমবারের মতো ৯০টি দেশে পালিত হয় এই দিবসটি। এরই ধারাবাহিকতায় পরিবার পরিকল্পনা, লিঙ্গসমতা, দারিদ্র্য, মাতৃস্বাস্থ্য এবং মানবাধিকারের মতো জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রতিবছর বাংলাদেশেও পালন করা হয় এই দিবসটি। এ বছর দিবসটির পতিপাদ্য হলো- **“Empowering Future Generations: Sustainable Development and Population Trends”**

একটি দেশের জনগণ তথা সাধারণ গণমানুষ দেশটির প্রধান চালিকাশক্তি বা প্রাণশক্তি। আর সে প্রাণের প্রকাশ বা স্পন্দন মনোরম হতে পারে যদি মানুষ সাধারণ খাদ্যে-স্বাস্থ্যে-শিক্ষায় সবল ও কর্মক্ষম থাকে। সমৃদ্ধ একটি দেশ নির্মাণ তাহলেই সম্ভবপর হয়। আমাদের আয়তন সীমিত, আমাদের উৎপাদন সীমিত। সে হিসেবে আমাদের দরকার জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা করা।জনসংখ্যার বিচারে আমাদের দেশ অষ্টমস্থানে রয়েছে। কোথাও কোথাও আবার নবমও উল্লেখ করা হয়েছে। গত আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা সাড়ে ১৬ কোটিরও বেশি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনবিন্যাসের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। জনসংখ্যা বাড়া-কমার গুরুত্বপূর্ণ সূচক টোটাল ফার্টিলিটি রেট বা টিএফআর। সহজ কথায়, এক জন নারী তাঁর সমগ্র জীবনে গড়ে যতজন সন্তানের জন্ম দেন, তার হিসাবই হচ্ছে টিএফআর। সাধারণত টিএফআর-এর মান ২.০ কিংবা তার নিচে হলে সেটি ‘প্রতিস্থাপনযোগ্য হার’ হিসেবে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নারীর সন্তানসংখ্যা গড়ে ২.০ হলে পরবর্তী প্রজন্মেও দেশের জনসংখ্যা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের টিএফআর ছিল ৩.৭। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের টিএফআর হয়েছে ১.৯। প্রতিস্থাপনযোগ্য টিএফআর ২.০ এর চেয়ে নিচে অবস্থান করছে বাংলাদেশের ফার্টিলিটি রেট। যা আন্তর্জাতিক সূচকে ১১২তম।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের যত অর্জন হয়েছে তার মধ্যে টিএফআর নিঃসন্দেহে অন্যতম একটি অর্জন। তবে বর্তমান বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় ২০৬৪ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত জনসংখ্যা বাড়বে। এরপর আবার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিষয়ক এই ভবিষ্যদ্বাণী অতীত ও বর্তমানের জনবৃদ্ধির তথ্য সম্পর্কিত মডেলের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। সাধারণত এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি অনুমান ভবিষ্যৎ অনুমানের তুলনায় অধিক চমক সৃষ্টি করে। সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তি, রাষ্ট্রীয়নীতি, মানুষের ধ্যানধারণা সবই পাল্টায়। জনসংখ্যা সম্পর্কিত এসকল ধারাণাও পাল্টাতে পারে। বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৯টি দেশে : ভারত, নাইজেরিয়া, কঙ্গো, পাকিস্তান, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, আমেরিকা, উগান্ডা, ইন্দোনেশিয়া। ২০২৪ সালে ভারত বিশ্বের সর্ববৃহৎ জন-অধ্যুষিত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সবচেয়ে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বর্ধনশীল দেশ হলো নাইজেরিয়া। পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যেখানে প্রতি মিনিটে ২৫০ শিশুর জন্ম হয়।বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে ১০টি শিশু। এক জরিপে দেখা গেছে যে, বর্তমানে জন্মগ্রহণকারী ১০০ জন শিশুর মধ্যে ৯৭ জন জন্মগ্রহণ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে।

বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে জনশক্তিকে আরও দক্ষ করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তরুণ যুব বেকারদের বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে তাদের কাজে লাগাতে হবে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সিংহভাগ অঞ্চলের মাটিই উর্বর ও আবাদযোগ্য। তাই আমাদের কৃষিক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারলে উৎপাদন বৃদ্ধি করা আমাদের জন্য সহজ। কৃষি, খাদ্য এবং জন্মনিরোধে বাংলাদেশের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। কৃষিকে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি বলা হচ্ছে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশে ১৫ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সের মানুষ বেশি, যারা কর্মক্ষম। দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ, প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। শুধু তাই নয় জনশক্তি রফতানির প্রক্রিয়া সহজিকরণসহ সহজশর্তে ঋণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। যার জন্য দরকার সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

বিশ্বে ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মানুষের গড় আয়ু ছিল ৬৭ থেকে ৭১ বছর। ২০৪৫-২০৫০ সালে এ গড় আয়ু দাঁড়াবে ৭৭ বছরে। ২০৯৫-২১০০ সালে সম্ভাব্য গড় আয়ু হবে ৮৩ বছর। এ পরিপ্রেক্ষিতে ষাটের দশক থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের

জনমিতিক সূচকের ব্যাপক অগ্রগতি প্রশংসনীয় : জনসংখ্যা বৃদ্ধি ১.৩৭ শতাংশ, পরিবারপ্রতি গড় সন্তান ২.০৪, মাতৃমৃত্যু ১.৬৩ (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে), নবজাতকের মৃত্যু ০-২৮ দিন ১৫ জন (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে), ০-১ বছরের শিশুমৃত্যু ১১ জন (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে), ০-৫ বছরের শিশুমৃত্যু ২৮ জন (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে), পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ৬৩.৯ শতাংশ, অপূর্ণ চাহিদা হ্রাস ১২ শতাংশ। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু এখন ৭২.৮ বছর। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড ৬৬ শতাংশ (১০ কোটি ৫৬ লাখ, ইউএনডিপি)। মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, শিশু, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, অটিজম সেবা ও পরামর্শের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারে শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এবং মা-শিশু স্বাস্থ্যে অর্জিত সূচক-সাফল্য রক্ষা করতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ৫৫ হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের তৃণমূল পর্যায়ের লব্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতায় ঘর থেকে ঘরে, ওয়ার্ড থেকে কমিউনিটিতে, সমতল থেকে দুর্গম জনপদে মানবিক 'মেন্টর' হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে রয়েছে উন্নয়নের সরাসরি সম্পর্ক। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবার পরিকল্পনা একটি প্রযুক্তি, যেখানে উন্নয়নের পূর্বশর্তকে বিবেচনায় রেখে সকল বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে এটি মানবতার কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।কায়রো সম্মেলনে (১৯৯৪) জনসংখ্যা ও স্থিতিযোগ্য উন্নয়নের অব্যাহত ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচিতে উন্নয়নধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রমকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে- যার মধ্যে আছে স্বাস্থ্য, চাকুরি এবং জনগণের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান।

যে কোনো একটি দেশে আর্থনীতিকভাবে অনুৎপাদনশীল বলা হয় শিশু এবং বৃদ্ধদের। এই শিশু ও বৃদ্ধের মোট সংখ্যাকে বাকি জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে পাওয়া যায় 'ডিপেনডেন্সি রেশিয়ো' বা 'নির্ভরতা অনুপাত'। এই অনুপাত যত কম হয় অর্থনীতির জন্য ততই ভালো হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ কর্মক্ষম বয়স সীমায় আবদ্ধ। তাই এই অনুপাতটা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। কিন্তু আজকের এই বৃহৎ সংখ্যক তরুণ ২৫-৩০ বছর পরেই বৃদ্ধ হয়ে যাবে। তাই শিশুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুব একটা না বাড়লেও লক্ষণীয় ভাবে বাড়বে 'নির্ভরতা অনুপাত'। আর নির্ভরতার অনুপাত বাড়লে অর্থনীতিতে সমস্যা সৃষ্টি হবেই। বিশ্বজুড়ে জনবিস্ফোরণের বোঝা এই একটি পৃথিবীর পক্ষে বহন করা বা মানুষ-প্রকৃতি-পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে। এ কারণে গ্রিনহাউজ গ্যাসগুলোর-কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, জলীয়বাষ্প, ওজোন, ক্লোরো-ফ্লুরো কার্বনের অতিরিক্ত ব্যবহারে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশ এ জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণতাজনিত দুর্যোগের অনিবার্য শিকার হয়ে তীব্র দাবদাহ, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এদেশের মানুষ, কৃষিজমি, সামগ্রিক উন্নয়ন ও অর্থনীতির ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় একদিকে যেমন বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরঘেঁষা অঞ্চল, মালদ্বীপ, নিউইয়র্ক, লন্ডন, সিউল, টোকিওসহ বহু উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রে তলিয়ে যাবে; আবার পৃথিবীপৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে মেরু অঞ্চলের বরফ ও হিমবাহ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে জলে ভাসবে মানুষ। আর কোটি কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হবে এবং অকালে অনাহারে, নিরাশ্রয়ী হয়ে ও দুর্ভিক্ষে মৃত্যুবরণ করবে। বাড়বে মানুষের দেশান্তরী হওয়া। গাছগাছালি ধ্বংস হবে। এক বৈশ্বিক মানবিক বিপর্যয় দেখবে তখন সারা দুনিয়া। এ অবনতিশীল বৈশ্বিক বিপর্যয় রুখতে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে প্রতিবছর ১৯৯০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত যত বাণী প্রতিপাদ্য হিসাবে পৃথিবীর সব রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনেতা, সুশীল সমাজ, নানা স্তরের মানুষকে সচেতন করতে জানানো হয়েছে তা হলো-পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছোট পরিবার গড়তে হবে। পরিবারে নারী ও শিশুর ওপর সহিংসতা ও বৈষম্য বন্ধ করে সমতা-সম্মান-মানবাধিকারের মাধ্যমে নারী, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও উন্নয়ন বিধান করতে হবে। বাল্যবিবাহ ও অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ হ্রাস করতে হবে। মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে মা ও শিশুমৃত্যু রোধ করতে হবে। কাঙ্ক্ষিত জন্মহার বা প্রজননহার যেন পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্বের উন্নয়ন, প্রকৃতি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে। বৈশ্বিক করোনা মহামারি ও বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্গতি মোকাবিলা করে নারী ও কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার নিশ্চিত করে জনসংখ্যা অবশ্যই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

এ কথা সত্য যে, সামগ্রিক জনসংখ্যার ছবি দেখে তার রূপ-বৈচিত্র, অর্ন্তনিহিত সম্ভাবনা এবং বিপদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করা যায় না। তাই সঠিক নীতি নির্ধারণের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। নারী-পুরুষের অনুপাত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং ভৌগোলিক ক্ষেত্রের মধ্যে জনবিন্যাসের পরিবর্তনে তারতম্য ইত্যাদি বিষয় 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-এর হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। এ সবের তত্ত্বতালাশও বেশ কঠিন। জনসংখ্যা বেশি হলে অসাম্যের সম্ভাবনাও বেশি। বিশেষত বাংলাদেশের মতো বৈচিত্রপূর্ণ দেশে এই অসাম্য সর্বত্র বিরাজমান। আর যে কোনো ক্ষেত্রেই অনভিপ্রেত অসাম্য তৈরি হলে প্রভাবিত হতে পারে সামাজিক সুস্থিতি। এজন্য প্রয়োজন নিরন্তর তথ্য বিশ্লেষণ, সঠিক পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ। বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বাংলাদেশের এক নম্বর

সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করেন। সে আলোকে ১৯৭৬ সালে প্রণীত হয় জাতীয় জনসংখ্যানীতি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের বাণীতে বলেন, “ভবিষ্যতের তরুণ সম্প্রদায়কে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।”

আজকের বিশ্বে বিপুল জনসংখ্যাকে কেবল সংখ্যা মনে করলে চলবে না। কেননা বিপুলসংখ্যক মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিত্যনতুন আবিষ্কার পৃথিবীকে সর্বাত্মক সমৃদ্ধ করছে। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের বাংলাদেশও হয়ে উঠুক পরিকল্পিত জীবনযাপনের মাধ্যমে একটি সুস্থ সমৃদ্ধ জাতি।

#

পিআইডি ফিচার